যুদ্ধ ও সহিংসতায় নারীই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দল

মোহাম্মদ হোসেন

ভূমিকা

যেকোনো সহিংসতা (সেটি সশস্ত্র হোক বা না হোক) চলাকালে এবং সহিংসতাপরবর্তী সময়ে নারীই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হন। নারীর এই ক্ষতি যেমন তাকে বাস্তুচ্যুত করে তেমনি স্বজন হারানো কিংবা হত্যা-আঘাত-ধর্ষণের শিকারে পরিণত করার মাধ্যমে তাকে অপূরণীয় ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। পুরুষের তুলনায় নারীর এই ক্ষতির মাত্রা তীব্রতর হওয়ার কারণ হলো সহিংসতার ফলে সৃষ্ট অরাজকতার সুযোগে নারী 'শত্রু' এবং 'মিত্র' উভয়পক্ষেরই আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। সহিংস যুদ্ধে নারীর ওপর শারীরিক নির্যাতনকে কখনো কখনো কৌশল হিসেবে দেখা হয়, যা ওই সমাজে একটি চিরস্থায়ী প্রভাব রাখে। সহিংস যুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে নারী শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার পাশাপাশি যৌনবাহিত দুরারোগ্য ব্যাধিতেও আক্রান্ত হন। ক্ষতির মাত্রাটি আরো তীব্রতর হয়ে সামনে আসে যখন যুদ্ধপরবর্তী সময়ে এই ধর্ষিত নারীদের 'অপবিত্র' আখ্যা দিয়ে সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাধ সাধা হয়। ফলে সহিংস যুদ্ধের নানা বিভীষিকাময় পরিস্থিতি পাড়ি দিয়েও যারা কোনোমতে বেঁচে যান, তারা পরবর্তী জীবনে হয় দূরারোধ্য রোগ সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনেন অথবা সমাজ ও পরিবার থেকে একপ্রকার নিগৃহীত হয়ে 'অচ্ছুতের' জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। অন্য উপায় না দেখে অনেক নারী যৌনতা বিক্রিকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। আক্ষেপের বিষয় হলো যুদ্ধে নারী ও পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক ভিন্ন অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না। ফলে যুদ্ধকাল ও তৎপরবর্তী সময়ে উদ্ধার তৎপরতাগুলোতে নারীর এই স্বকীয় নাজুকতার দিকটি প্রাধ্যান্য পায় না।

যুদ্ধের অমোঘ শিকার নারী

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ৬৯টি দেশের মধ্যে ১০৩ বার সশস্ত্র সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এই হিসেব আমাদের এটি প্রতীয়মান করতে বাধ্য করে যে, খুবই ঘন ঘন দেশে দেশে সহিংসতা দেখা দিচ্ছে (ইউএনএইচসিআর, ২০০৫)। সহিংসতায় নারী এবং পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক আলাদা পরিণতি থাকলেও ইতিহাসে বা সামাজিক গবেষণায় এই বিষয়টি এতদিন অবহেলিতই থেকে গেছে। বর্তমান সময়ে সংঘটিত যুদ্ধের প্রক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুদ্ধে নারীকে বিশেষ উপায়ে টার্গেট করা হয়। প্রাচীন গ্রিক যুদ্ধ, রোমান যুদ্ধ এবং হিব্রু যুদ্ধেও নারীর প্রতি লক্ষ্যীভূত এরকম সহিংসতা দেখা যেত না। বর্তমানকালের যুদ্ধগুলোতে নারীর প্রতি সহিংসতা তখনই মারাত্মক রূপ লাভ করে যখন মিলিটারির সাথে সাথে সিভিল সমাজও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে নারীসমাজ মিলিটারি এবং সিভিল সমাজ উভয়েরই আক্রমণের বিষয়ে পরিণত হন।

আইসিআরসি'র ২০০৯ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, ইরাকি নারীরা বিগত ৩০ বছর ধরে সিভিল সমাজকে আক্রমণকারী যেকোনো সশস্ত্র সহিংসতার বড়ো শিকার। এসব সহিংসতায় নারীরা অধিকাংশ সময়ই ক্রসফায়ার ও বিস্ফোরণে আক্রান্ত ও নিজ বাসভূম থেকে চ্যুত হন। এছাড়া নারীরা এইসব যুদ্ধে যৌন নির্যাতনসহ অপহরণ, হারিয়ে যাওয়া, পাচার হয়ে যাওয়া এবং প্রতারণার শিকার হন (আইসিআরসি, ২০০৯)। ইউএনএফপিএ-এর ২০০৬ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায়—

- বসনিয়া-হারজেগোভিনার গৃহযুদ্ধ ও গণহত্যায় প্রায় ৪০,০০০ যুদ্ধসংশ্লিষ্ট ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।
- ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে সার্বিয়ার সহিংসতায় অনুমানিক ২৩,২০০ থেকে ৪৫,৬০০ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।
- ২০০৩ সালে লাইবেরিয়া থেকে স্থানচ্যুত হওয়া নারীদের মধ্যে দৈবচয়নিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত ৩৮৮ নারীর মধ্যে ৭৪ জন বলেন, তারা দেশ থেকে উচ্ছেদ হওয়ার সময় যৌন হয়রানির শিকার হন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই নারীদের ৫৫ শতাংশই যৌন হয়রানির শিকার হন।

- ১৯৯৮ সালে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে সহিংসতার কারণে ১০ শতাংশ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। জাতিসংঘের হিসেব মতে, এই সময় ৫,০০০ নারী যৌন হয়রানির শিকার হন।
- ২০০০ সালের একটি গবেষণা প্রতিবেদন দেখায়, সিয়েরালিওনের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির সময় ৫০,০০০ থেকে ৬৪,০০০ নারী যৌন হয়রানির শিকার হন (ইউএনএফপিএ, ২০০৬)।

যুদ্ধের সময় নারীর প্রতি যৌন সহিংসতার বিষয়টিকে যুদ্ধকালীন সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়ার সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। এটি যুদ্ধউন্মাদনার একটি কুফল। কয়েক মাস বয়সী শিশুদের ধর্ষণের ঘটনাও এসময় ঘটে থাকে (আইসিআরসি, ২০০৯)। যুদ্ধের এই উন্মাদনার সুযোগে অনেক সময় স্থানীয় মানুষজনও তাদের এলাকাবাসী নারীদের ধর্ষণ করে থাকে, কারণ এসময় শাস্তির ভয় থাকে না। ধর্ষণকারীরা এসময় সামাজিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার সুযোগে ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এই বিশৃঙ্খল অবস্থাতেই ১৯৯৬ সালে তালেবানরা ক্ষমতা দখল করে; যাতে নির্যাতিত নারীদের একধরনের সমর্থন ছিল।

যুদ্ধের ভয়াবহতার অন্য একটি দিক হলো আক্রান্ত এলাকার নারীদের ধর্ষণ করা, যা তাদের অবস্থাকে আরো অমানবিক ও লজ্জাজনক করে তুলে। পূর্ব-তিমুরে আক্রমণের সময় ইন্দোনেশিয়ার সৈনিকরা গণহারে তিমুরের নারীদের তাদের পরিবারের সদস্যদের সামনে ধর্ষণ করে এবং তিমুরের পুরুষদের তিমুরের নারীদের ধর্ষণ করতে বাধ্য করে। ২০০৪ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ১৮ বছর ধরে যুদ্ধে আক্রান্ত রুয়ান্ডাতে অনেক সময় সিভিলিয়ানদের জোর করে ধর্ষণে অংশগ্রহণ করানো হতো (এআই, ২০০৪)। অনেক সময় সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ যৌনসম্পর্কেও বাধ্য করা হতো, যেমন বাবা বা ভাইকে বাধ্য করা হতো তাদের মেয়ে বা বোনকে ধর্ষণ করার জন্য। বেশিরভাগ সময়ই এই ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটত পরিবারের অন্য সদস্যদের সামনেই (ইউএনএইচসিআর, ২০০৩)। যুদ্ধের একটি কৌশল হলো নারীর প্রতি সহিংসতার মধ্য দিয়ে স্থানীয় বিরোধী বাহিনী এবং স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা। এক্ষেত্রে নারীকে যৌন নির্যাতনের পর বিকৃত উপায়ে হত্যাও করা হয়। চেচেনদের সাথে রাশিয়ার মিলিটারি যুদ্ধের সময় রাশিয়ান সৈনিকরা চেচেন নারীদের বিকৃত উপায়ে যৌন নির্যাতন করত এবং হত্যা করত, যার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতাকেই প্রকাশ করা হতো। এ বিষয়টিকে উপমায়িত করা হয় এভাবে যে, 'নারীর শরীর হলো এক ধরনের খাম, যা যুদ্ধের ভয়াবহতার বাণী বহন করে।'

জাতি, গোত্র, ধর্ম বা অন্য কোনো বিভাজনরেখার ভিত্তিতে যে সহিংসতাগুলো সংঘটিত হয় তার লক্ষ্য থাকে প্রতিপক্ষ জাতি, গোত্র বা ধর্মীয় মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। বসনিয়ার যুদ্ধে যে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, তার লক্ষ্য ছিল বসনিয়ায় বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বাস্তুভূমি থেকে বিতাড়িত করা; অথবা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা যাতে মুসলিমরা স্বেচ্ছায় ওই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। জোরপূর্বক গর্ভবতী করা, নারীর জননতন্ত্র নষ্ট করে দেয়া এবং এইচআইভি ছড়ানো এই ধরনের জাতি বা গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার উল্লেখযোগ্য কৌশল। রুয়ান্ডায় যেমন গণধর্ষকরা এইচআইভিআক্রান্ত ছিল। অন্যদিকে বসনিয়ায় ধর্ষণের পর মুসলিম নারীদের অনেকটা সময় পর্যন্ত আটকে রাখা হতো, যাতে তারা গর্ভপাতের সুযোগ না পান। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সকল সমাজেই যুদ্ধশিশুরা একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়, যাদের সমাজ গ্রহণ করতে চায় না (ইউএন, ২০০২)।

সহিংসতার সময় যোদ্ধারা যৌন ভোগবিলাসের জন্য নারীদের জোরপূর্বক ক্যাম্পে ধরে এনে তাদের গণহারে ধর্ষণ করে। অন্যদিকে যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিক নারীদের সামরিক দায়িত্বের একটি হলো এই সহিংসতার সময়ে পুরুষ সহযোদ্ধাদের যৌনচাহিদা পূরণ করা। আবার স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করতে আসা নারীদেরকেও সহযোদ্ধারা জোরপূর্বক যৌনসম্পর্কে নিয়ে যায়; যেমনটি লাইবেরিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়। একজন নারীযোদ্ধা বলেন, 'আমি ২৪ ঘণ্টা এটা নিয়েই চিন্তিত যে আজ রাতে আমাকে কোন অফিসারের সাথে শুতে হবে।' নেপালের মাওবাদী আন্দোলনে নিয়োজিত এক নারীযোদ্ধা বলেন, 'প্রতিদিন আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডজনখানেক সৈনিককে সন্তুষ্ট করতে হতো'। যুদ্ধে এভাবেই নারীদের যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয় অহরহই।

যুদ্ধ ও নারী

ইউএনএফপি'র হিসেব মতে, ২০০৪ সালের বিভিন্ন সশস্ত্র সহিংসতায় মোট ৩৪ মিলিয়ন মানুষ স্থানচ্যুত হয়। এর মধ্যে ৯.৩ মিলিয়ন মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশে শরণার্থীতে পরিণত হয় এবং বাকি ২৫ মিলিয়ন মানুষ নিজ দেশের মধ্যে স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে। এই ধরনের স্থানচ্যুতির প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যেও নারীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দল। পালিয়ে যাওয়ার সময়ও এমনকি নারীরা ডাকাত, বিদ্রোহী দল, মিলিটারি বা সীমান্তরক্ষীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হন। যেমন পথে অর্থ বা সম্পদ না থাকলে ডাকাত বা পথরোধকারীদের যৌন নিপীড়নের মুখোমখি হতে হয়। মূলত নিরাপত্তাবিহীন হয়ে পালিয়ে যাওয়ার ফলেই নারীদের নাজুকতার ব্যাপকতা বাড়ে। নিরাপদ বাসস্থান, খাদ্য ও নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য নারীদের নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পাকিস্তানের পেশোয়ারে আশ্রয় নেয়া আফগান নারীদের ভাড়ামুক্ত বাড়ি পেতে বাড়ির মালিকের সাথে যৌনসম্পর্কে যাওয়ার ঘটনা দেখা যায়। ২০০৩ সালের কলাম্বিয়ার একটি রিপোর্ট দেখায়, স্থানীয়ভাবে স্থানচ্যুত ৩৬ ভাগ নারীকে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। অল্পবয়সীদের জন্য এই নির্যাতন ছিল অতিমাত্রায় বেশি (Brett, 2003)।

সহিংসতার সময় নিয়মিত পুলিশিং ব্যবস্থা ও সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে পাচারকারীদের কার্যকলাপ বেড়ে যায়, যার প্রধান শিকার নারী ও শিশুরা। সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়তে হয় নারী ও শিশুদের। কলাম্বিয়ার প্রেক্ষিতে ২০০০ সালের একটি রিপোর্টে দেয়া যায়, ৩৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ নারী এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় পাচার হন। বার্মায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সহিংসতার কারণে প্রতিবছর প্রায় ৪০,০০০ নারী পতিতালয়, কারখানা ও গৃহস্থালির শ্রমিক হিসেবে থাইল্যান্ডে পাচার হন।

আফ্রিকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, স্থানীয় স্থানচ্যুত মানুষের জন্য সরকারি ক্যাম্প ব্যবস্থাগুলো নারীদের যৌন নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য কিছুটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কিন্তু ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে গিয়েও নারীরা যৌন নিপীড়নের শিকার হন। এসব ক্যাম্পের প্রহরায় থাকা নিরাপত্তারক্ষিদের হাতেও নারীকে যৌন নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া ক্যাম্পে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত লোক থাকা, অপর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, নারী এবং পুরুষের পাশাপাশি গোসলখানা ও পায়খানা এবং সম্পদের অপর্যাপ্ততার কারণেও নারীর ওপর সহিংসতার সুযোগ তৈরি হয়। এমনকি যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়াও নারীর জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে না। বরং যুদ্ধপরবর্তী নাজুক পরিস্থিতিতেও নারীরা নানাভাবে এবং নানারকম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ইরাকে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নারীরা তাদের এলাকাবাসী পুরুষদের দ্বারা ক্রমশই যৌন নির্যাতনের সম্মুখীন হতে থাকেন। যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রের কার্যকর পুলিশিং ব্যবস্থা না থাকার কারণে নিপীড়করা কোনো ভয়ভীতি ছাড়াই যৌন নির্যাতনে অংশ নেয়। এরকম পরিস্থিতিতে আবার নারী ও শিশু পাচার মাত্রাধিক বেড়ে যায়।

বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠন প্রকল্পগুলোও এই অবস্থার বড়ো পরিবর্তন আনতে পারে না। যেমন রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধপরবর্তী সময়ে রুয়ান্ডার আইনের কারণে নারীরা তাদের মৃত বাবা বা মায়ের সম্পদ পান না। ফলে নারীরা তাদের আবাসস্থলে ফিরে আসেন পূর্ব-পুরুষের কোনো সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছাড়াই। সম্পদহীনতার কারণে এই নারীদের যৌনতা বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো পথ প্রায়ই খোলা থাকে না। অনেক যৌননিপীড়িত নারীকে 'পবিত্রতা হারিয়েছে' বলে পরিবার বা সমাজ গ্রহণও করতে চায় না। অপহরণের পর মুক্তি পেলে বেশিরভাগ নারী মানসম্মানের ভয়ে নিজ বাসভূমে ফিরে যেতে পারেন না। ধর্ষিত মেয়েকে সমাজ সহজে গ্রহণ করতে চায় না, এই কারণে সমাজে তাদের অভিযোজনের সমস্যা সবসময় থেকেই যায়। বুরুন্ডিতে দেখা যায়, ধর্ষিত হওয়া নারীদের এমনকি তাদের নারী আত্মীয়, সহপাঠী, প্রতিবেশী এবং পরিবারও গ্রহণ করে নি। স্বামীরাও তাদের ধর্ষিত হওয়া স্ত্রীদের গ্রহণ করতে চান না। তারা মনে করেন, তাদের স্ত্রীরা হয়ত এইচআইভি বহন করছেন কিংবা ধর্ষিত হওয়ার কারণে 'পবিত্রতা' হারিয়েছেন। ফলে এই নারীদের সমানে যৌনতা বিতরণের পেশা অর্থাৎ যৌনতা বিক্রি ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না।

সহিংসতায় যৌন হয়রানির শিকার নারীরা সহিংসতাপরবর্তীকালে সমাজে অভিযোজনের ক্ষেত্রে এবং শারীরিকভাবে নানা জটিলতায় ভোগেন। গণধর্ষণের শিকার এসব নারী প্রজননতন্ত্রের নানা জটিলতায় ভোগেন, যার ফলে অনেক নারীর গর্ভধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। অন্যদিকে ধর্ষিত নারীদের মধ্যে যৌনবাহিত রোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি।

২০০০ সালের রুয়ান্ডায় সম্পাদিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ধর্ষিত ৬৭ শতাংশ নারী এইচআইভিআক্রান্ত। স্বাস্থ্যসেবার মান যথাযথ না হওয়ার কারণে যুদ্ধপরবর্তী সময়েও এই রোগাক্রান্ত নারীরা চিকিৎসা সেবা নিতে পারেন না। অন্যদিকে এই নারীদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় তারা একরকম নিরাপত্তাহীনতা ও অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে বসবাস করেন।

ইরাকের নারীপ্রধান পরিবার

যেকোনো যুদ্ধের একটি মৌলিক পরিণতি হলো কিছু নারীপ্রধান পরিবার সৃষ্টি হওয়া। হত্যা বা অপহরণ কিংবা অন্য কোনো কারণে পুরুষদের হারিয়ে ফেলার ফলে পুরুষবিহীন এই নারীপ্রধান পরিবাগুলো সৃষ্টি হয়। এসব নারী সমাজে নিগৃহীত হন ওই হারিয়ে যাওয়া পুরুষের স্ত্রী হিসেবে। বহুদিন ধরে সহিংসতার কারণে ইরাকে বর্তমানে ১ থেকে ৩ মিলিয়ন নারীপ্রধান পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে (HRW, 2003)। স্বামী, যিনি ছিলেন মূলত পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী, তার অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকেই সন্তানের খাদ্য, চিকিৎসা ও স্কুলের খরচ বহন করতে হয়। এটি ইরাকি নারীদের কঠিন সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। আবার সামাজিক রীতির কারণে স্বামী হারানো এসব নারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ পান না। তবে যুদ্ধকালে নারীরা প্রথাগত নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় সীমাবদ্ধ না থেকে বরং সামষ্টিক এবং পেশাগত পরিসরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

স্বামীহীন ইরাকি নারীদের ভোগান্তির অন্য আর একটি কারণ হলো, ইরাকে এমন এক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কার্যকর, যা নারীদেরকে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। ফলে পুরুষ ছাড়া ইরাকি নারী অর্থনৈতিক, শারীরিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এমন পরিস্থিতিতে নারীরা অনেক সময় তাদের পৈতৃকবাড়ি বা শ্বশুড়বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিন্তু পরিবারগুলোও সহিংসতায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে বাড়তি মানুষের দায়িত্ব বহন করতে পারে না। আবার এভাবে অন্য পরিবারের ওপর নির্ভর করাটাও ইরাকি সমাজে অসম্মানজনক। পুরুষবিহীন এই পরিবারগুলো একরকম সহায়-সম্বলহীনভাবেই রয়ে গেছে। কারণ নতুন পরিস্থিতিতে নারীকে উপার্জনের ভার নিতে হয়, যার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বঅভিজ্ঞতা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা ইরাকি নারীর নেই। আবার সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারীরা উপার্জনে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হন না। কিন্তু জীবনের দায়ে এই অচেনা পথে তাদের চলতে হচ্ছে, যেখানে তাদের জন্য কোনো সুযোগ তৈরি করা নেই, বরং পদে পদেই রয়েছে বাধা। এরকম অনেক পরিবারই বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, যাদের জন্য সরকারি সাহায্যের খাতগুলো খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অনর্থক দীর্ঘসূত্রিতাপূর্ণ। অনেক সময় অপহৃত পুরুষের পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানরা নিশ্চিত হতে পারেন না যে তাদের স্বামী, সন্তান কিংবা বাবা বেঁচে আছেন না মরে গেছেন। বছরের পর বছর তারা তাদের হারানো আত্মীয়দের খুঁজে বেড়ান। স্বামীর মৃত্যুর অনিশ্চয়তা তাদের ভবিষ্যতকেও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়, কেননা স্বামীর মৃত্যুর নিশ্চয়তা ছাড়া স্ত্রীরা স্বামীর পেনসনও দাবি করতে পারেন না। এমনকি পুনরায় বিয়েও করতে পারেন না।

উপসংহার

খেয়াল করার বিষয় হলো, সংহিসতায় নারী-পুরুষের ভিন্ন পরিণতির বিষয়টি এতদিন মনোযোগের জায়গা পায় নি। বরং এসব সহিংসতাকে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমাজের যেকোনো মানুষের জন্য যুদ্ধ চরম ভোগান্তি নিয়ে আসে। কিন্তু নারীর জন্য যুদ্ধের পরিণতি পুরুষের তুলনায় ভিন্ন মাত্রা ও ভিন্ন পরিণতি নিয়ে হাজির হয়। নারীর প্রতি সহিংসতার বিচিত্র ধরনগুলো মূলত যৌন-পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত। যুদ্ধে যোগদানকারী পুরুষ সৈনিকরা কোনো অঞ্চল দখল করার পাশাপাশি অনেক নারীকেও দখল করে বসে, যাদের তারা নির্বিচারে ভোগ, হত্যা বা যাচ্ছেতাই করতে পারে। নারীর জন্য এসবের পরিণতি ভয়াবহ। অনেক নারীকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়। কিন্তু এরপরও যারা কোনো উপায়ে বেঁচে থাকেন তাদের পরবর্তী সময়ে ভীষণ মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক মানবাধিকার সংগঠন নারীর এই নাজুকতার দিকটিকে সামনে আনছে ও নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। কিন্তু আদতে কোনো উদ্যোগই কার্যকর হবে না যদি সহিংসতায় নারীর স্বকীয় দিকটিকে বিবেচনা করা না হয়। এই ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন রিলিফ প্রক্রিয়াগুলোতে নারীকে ভিন্নভাবে গুরুত্ব দেয়াটা একধরনের উদ্যোগ হতে পারে, পাশাপাশি যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সামাজিক অভিযোজনের ক্ষেত্রে সমাজগুলোকে আরো সহনশীল করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে নারীর স্বাস্থ্যসেবা, বিচার বা আইনি সেবা, নিরাপত্তা ও জীবনরক্ষার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ

করাও জরুরি। তবে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তৈরি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ একটা বিকল্প পথ দেখাতে পারে, যা কেবল নারীর জন্যই নয় বরং মানবতার জন্যও কল্যাণকর বটে।

মোহাম্মদ হোসেন অ্যাসিসটেন্ট ফেলো, আরঅ্যান্ডপি ডিভিশন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। bidhu2001@yahoo.com।

তথ্যসূত্র

1. ICRC (2009); Women in war.
2. UNFPA (2006); Sexual Violence against Women and Girls in War and Its Aftermath: Realities, Responses, and Required Resources, Brussels.
3. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugees By Numbers (2005 Edition) (2005). Available from: www.unhcr.ch.
4. UN Security Council, Report of the Secretary-General on women, peace and security (October 2002): 2.
5. HRW, Iraq: Insecurity Driving Women Indoors (2003).
6. AI, Rwanda: Marked for death, Rape Survivors Living with HIV/AIDS in Rwanda, (April 2004): 9.
7. 58 RHRC, Gender-based Violence: Key Messages. Available from: www.rhrc.org/rhr_basics/gbv
8. Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response, UNHCR, May 2003
9. Brett (Rachel), "Adolescents volunteering for armed forces or armed groups," International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 852, December 2003